কবিতার বাতাস ঈশ্বরের আলো

ধ্রুব বসু

Bishnu 2006

কবিতার বাতাস ঈশ্বরের আলো

ধ্রুব বসু

কৃষ্ণসীস প্রকাশন
জে. কে. পাল লেন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ১৩

KABITAR BAATAS ISHWARER AALO
(a book of poems by DHRUBA BASU)
Published by Rajib Lochan Bhattacharjee, Krishnasis Prakashan
J. K. Paul Lane, Benachity, Durgapur - 13

প্রথম প্রকাশ
কৃষ্ণসীস উৎসব ২০০৭ (২২ অগ্রহায়ণ ১৪১৪)

প্রচ্ছদ : বিষ্ণু সামন্ত

অক্ষর বিন্যাস : রিগালিয়া ইনফোসিসটেমস্

কৃষ্ণসীস প্রকাশনের পক্ষে রাজীব লোচন ভট্টাচার্য কর্তৃক জে. কে. পাল লেন,
বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ১৩ থেকে প্রকাশিত এবং কৃষ্ণসীস প্রকাশনের সহায়তায় মুদ্রিত

মূল্য : ষাট টাকা

সূচি

পনেরো বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু করি। যে স্কুলে পড়তাম, সেই স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ৺দেবব্রত ভরদ্বাজ আমায় বলেছিলেন— 'কিছু চাই না, শুধু চাই বড় হলে যেন তোর বাড়িতে একটা লাইব্রেরী থাকে। আর সেখানে অন্তত পাঁচটা বই থাকে তোর লেখা।' সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত, অর্থাৎ নবম শ্রেণী থেকে কবিতা লেখা শুরু করার সময় থেকে, আমার একটিই বই প্রকাশিত হয়েছে এবং বোধ হয় বর্তমানটাই শেষ, তাও ভ্রাতৃপ্রতিম সাহিত্যিক উদারচেতা প্রকাশক রাজীব লোচন ভট্টাচার্যের সৌজন্যে। যাকে হাত ধরে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন আরেক ভ্রাতৃপ্রতিম সুহৃদ ড. শংকর চক্রবর্তী।

আমার সেই প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উঠোনে বৃষ্টির শব্দ' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। আমার এবং মুদ্রকের অনভিজ্ঞতা হেতু বইটার গ্রন্থনা, বহিরাঙ্গিক পারিপাট্য ছিল একেবারেই শিক্ষানবীশের মতো। অল্প কিছু ছাপা হয় এবং বিনামূল্যে বিতরণ করতে করতেই তা শেষ হয়। আমজনতার কাছে সেই বই পৌঁছায়নি, যদিও আজকাল, যুগান্তর দৈনিকদ্বয় এবং কিছু লিটল ম্যাগে গ্রন্থটি প্রশংশিত হয়। এই কারণে, এবং প্রথমোক্ত মুখ্য কারণে 'উঠোনে বৃষ্টির শব্দ'-র কিছু কবিতা আমার এই বইতেও অন্তর্ভুক্ত করা হল।

এই বই প্রকাশকালে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি শ্রদ্ধেয় শ্রী অমূল্য চক্রবর্তী, শ্রী দীনেশচন্দ্র সিংহ, শ্রী পিনাকীরঞ্জন গুহ, শ্রী অসীম রেজ, শ্রী সুরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রী অমল শুরকে— যাঁরা আমায় নিরন্তর কবিতা লেখার প্রেরণা যুগিয়েছেন। এবং স্মরণ করি আমার জ্যাঠতুতো দাদা শ্রী প্রদীপ বসু ও চৈতন্য স্বরূপা প্রয়াত লেখিকা কবিতা সিংহকে।

অসকার ওয়াইল্ড বলেছেন, আমরা সবাই একটা নর্দমায় শুয়ে, তবু তার মধ্যে কেউ কেউ তাকিয়ে আছি নক্ষত্রের দিকে। আমার কবিতাও নক্ষত্রের দিকেই তাকিয়ে থাকতে চেয়েছে। কতটা সফল হয়েছে, পাঠকরা বিচার করবেন।

ধ্রুব বসু

উৎসর্গ

ডা. সৌম্য চন্দ্র

ডা. মধুসূদন মণ্ডল

ডা. পূর্ণেন্দু মহাজন

জাগো

(পরমারাধ্য গুরুজী শ্রী শ্রী ঁগৌর গঙ্গোপাধ্যায়কে স্মরণ করে।)

জাগো গহনহৃদয়ের শুভ্র পুণ্যপ্রতিমা
জাগো অপ্রত্যক্ষ, অবক্ষ্য, অপাবৃত ব্রহ্মবিন্দু
জাগো অনলস, অনিবার, অনন্ত অমৃতপ্রবাহ
জাগো প্রেম, জাগো অর্ঘ্য, জীবনমন্থিত পরমেশ্বরচেতনা।

কবি

এমনকি মৃত্যুও তাকে ভালোবাসে,
শুধু মানুষই মুখ ফেরায়
কেননা মানুষ এই গাছ, জল, মৃত্যুর স্বাভাবিক
রীতি-বহির্ভূত হতে চায়।
যখন মুগ্ধতা জাগে
অথবা শব্দের মর্মরধ্বনি
গ্রাস করে সত্তার উপত্যকা,
রুদ্রাক্ষের মতো এক জোড়া চোখ
অপলক তর্জনী তুলে কবির দিকে
তাক করে

তবুও নিখাদ মমতায়
মানুষকে সে ধরে রাখে
নুলিয়ার মতো,
ভাইকিং জানে না—
মানুষের দেহসার হয়ে কবি বেঁচে থাকবে
আজীবন অনন্তকাল।

চিরমায়া

আপাদ মূল চায় অলৌকিক জল
স্বগত মননে ব্যাপ্ত আশ্চর্য বেদনা
এ আশ্চর্য বেদনা আমি কার হাতে দেবো অর্ফিয়ুস ?
নারীর ভিতর পাপ : মানুষের ভিতর ঘুণ
রোদের ভিতর ছায়া বাড়তে বাড়তে
গ্রাস করে বিশল্যকরণী
এ আশ্চর্য বেদনা আমি কার হাতে দেবো অর্ফিয়ুস ?

বিলোম লৌকিকে
শীতল বাতাস এসে
সমস্ত রূপালি পালক খসিয়ে নেয়—
মৃত্যু তার ভারী পা ফেলে হাঁটে
দ্বিধাজীর্ণ চৈতন্য ও সত্তায়,
শিয়রে যার সংক্রান্তি
রক্তে যার ফেনাগ্রসঞ্চার
শূন্যে করক্ষেপ করে সে শুধু ছেনে আনে
মোহিনী শূন্যতা
এ আশ্চর্য শূন্যতা আমি কার হাতে দেবো অর্ফিয়ুস ?

মানুষ-১

গাছেরা শুধু জানে কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মানুষ
জানে না দাঁড়াতে, সতত চলনাম চরণযুগল
চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে যায় রূপ থেকে রূপে
নাটকের ছন্দের মত—

বটবৃক্ষ বটবৃক্ষই থাকে
মানুষ অতিমানুষ হয়।

বিসময়ে তবু মানুষেরা গাছ হয়। সমস্ত কলকাঠি
থেমে গেলে মানুষও পড়ে থাকে
শালগ্রাম শিলা হয়ে। সাপেরা ঘুমোতে গেলে
একটি চলমান ছায়া ধীরে ধীরে অতিক্রম করে
জনপদ। নির্জন পাহাড়তলিতে
যক্ষ লিখে রাখে দূরবাসিনী নায়িকার কথা।

মানুষ-২

"tooth for tooth: nail for nail:
blood for blood"

মানুষ মানুষকে
যত সহজে দুঃখ দিতে পারে
তত সহজে সুখ দিতে পারে না।
বুকের পাঁজর খসিয়ে
কেউ যখন সুখশৃঙ্গে ওঠার চেষ্টা করে
অন্যেরা পিছন থেকে তার কোমর টেনে ধরে।
বন্ধুর মুখের দিকে
চাঁদপানা হাসি ছুঁড়ে দেবার অন্তরালে
মানুষ তার কোটের ভিতর শানাতে থাকে বাঘনখ।

অথচ মানুষ মুখস্থ করে মুনুষ্যত্বের বাণী
মানুষ লেখে ভালোবাসার কবিতা
মানুষ দেখতে পায় না
মানুষের সভ্যতার জয়রথ
কখন তীব্র বেগে ছুটে যায় সূর্যের দিকে।

পরবাস

শিথিল হয়ে আসছে গ্রন্থিগুলো
চোখের সামনে ধুলো শুধু ধুলো;
রাতের তারা বলছে, 'এসো কাছে,'
এইভাবে কি কেউ কখনও বাঁচে?

খেয়ালী মন কোথায় যাবে জানে না মন
বুকের মধ্যে অহর্নিশ খাণ্ডব দহন
বিলোম ক্ষৌণী তাঁবুর ভিতর বাড়িয়ে মুখ
বলছে, 'কবি, এই গুমরে হচ্ছে কি সুখ?'

ছিল আমার কনকচাঁপার উশীর-ছায়া
লুকিয়ে মুখ নদীর বুকে উজান বাওয়া
ছিল আমার বিম্বাধরার লুব্ধ হাসি
এখন শুধুই চোখের জলে ভাত মাখি।

এই পৃথিবী দেয় না কিছুই আমার হাতে
একটা জনম, হাজার মরণ আর
এই নিয়েই পাকদণ্ডি পথ
পেরোতে হবে আঁধার দুর্নিবার।

অমলের কবিতা

'আসলে এটি আদৌ কোনো কবিতা নয়!'
— বলতে সে কিশোর অমল
ভয়ানক মুষড়ে পড়েছিল।
তারও স্বপ্ন ছিল
ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়িতে চেপে...
বসবে সে বিশাল কুর্শিতে
কোনো এক জনাকীর্ণ সাহিত্যসভায়।

ভোরের প্রথম ট্রাম চলে গেল,
অলীক স্বপ্নের মতো মুছে গেল
ঘাসের বুকে শিশিরবিন্দু,
কুয়াশা ভেদ করে জেগে উঠলে
অতিমানবিক স্থাপত্যকলা
সবাই দেখল একটি গাছের নীচে
শুয়ে আছে অমলের মৃতদেহ,
আর তার কবিতার পাতা উড়ে যাচ্ছে
গাঙ্গেয় মোহানার দিকে।

বৃদ্ধত্বে

সেদিনের কথা মনে পড়ে গেলঃ
　　　　সেদিনের সোনালি দিন
　　　　সেদিনের বাতাসি সিগ্ধতা
　　　　সেদিনের আনন্দ-বিভাস
　　　　পাহাড়ি ঝর্ণার শব্দ
　　　　আর নক্ষত্র-স্বপ্নের গান।
সেদিনের কথা মনে পড়ে গেলঃ
　　　　সেদিনের গোলাভরা ধান
　　　　সেদিনের বালিয়াড়ি চর
　　　　সেদিনের বটবৃক্ষ-ছায়া
　　　　হলুদ খেতের গন্ধ
　　　　আর বাঁশবনে মেডুসার চোখ।
এখন শুধু শীর্ণতা
এখন শুধু ধন্বন্তরি-ঈশ্বর
এখন শুধু স্মৃতি-অপরাহ্নতা
দাওয়ায় হুঁকোর শব্দ
আর মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া।

জনৈক আমলার চিঠি

সুষেণ—
তোমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলাম,
তোমার গল্পে শুধু
ক্লান্তি আর ফুরিয়ে যাওয়ার কথা কেন ?

তখন আমি আমলা ছিলাম না
এখন আমি আমলা হয়েছি।

সুষেণ,
তুমি আরও একটা
ফুরিয়ে যাওয়ার গল্প লিখো—
এই জ্যামিতিক জীবন আর জীর্ণতার কথা,
লিখো, ক্লান্তির কথা শুনলে
কেন আজকাল আমার এত ভয় হয়।

দূরত্ব

দূরত্ব কভু বা ঈশ্বরের দূত হয়ে আসে।
বুকের কপাট খুলে যায়
কাছে থেকেও যে ছিল না কাছে
কাচের দরোজা আড়াল সরিয়ে
দূরাবহ গন্ধ নিয়ে আসে।

দূরত্ব কভুও বা
অভিসার, অনুসন্ধান, পরমাত্মীয়তার
অলৌকিক ঢাকনা খুলে দেয়;
নদীর ব্যবধান যত বাড়ে
নদী তত নিকটবর্তী হয়।

রুটি

রুটি নিয়েই যত গোলমাল
এই পৃথিবীতে, কেউ বেশি রুটি খাচ্ছে,
কেউ বা রুটি পাচ্ছেই না। এই নগ্ন,
কৃশ, একান্ত একটা রুটি— কত জোর তার।
যক্ষপুরীতে রাজা জমাচ্ছেন সোনা
সন্ত্রাসী কাঁপিয়ে তুলছে জগৎ—
সব এই রুটির কথা ভেবেই।
তা যে বেশি রুটি খাচ্ছে
সে দুটো দিয়ে খেলেই তো পারে,

কিন্তু তা কখনোই হবে না।
কারণ যে বেশি খাচ্ছে
তাকে তো বিশ্বশান্তি দিবসের
অনুষ্ঠানে সভাপতি হতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী

স্বাধীনতা সংগ্রামীকে বললাম,
'চেয়ারটা একটু টেনে দেবেন?'
তারপর চেকটা লিখতে লিখতে বললাম,
'অনেকগুলো টাকা পেয়ে গেলেন।'
'হ্যাঁ ঠিকই, তবে লালমুখোদের
চেয়ার বয়ে দিলে, এর থেকে
অনেক বেশি টাকা পেতাম'
স্বাধীনতা সংগ্রামী বললেন;
তারপর তার আগুন ঝরা দৃষ্টি দিয়ে
আমাকে পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

পদাবলী

টানা ফুটপাথ ধরে হাঁটে জীবন্ত শবেরা যত
অস্তিত্ব হয়েছে কীর্ণ ভয়ঙ্কর মসীবর্ণ মেঘে
চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও তব হতমান চাঁদ
তোমার সুষমা গেছে জীবনের বিযুক্তির স্বেদে।

আমাদের জীবনে জীবনের বিষণ্ণতাই সার
আমাদের ইতিহাস চিরকাল ভরা রক্তপাতে
আমাদের জনমার্থ উন্মোচন নরকদুয়ার
আমাদের দিনপাত পরস্পর ক্রুর জুগুপ্সাতে।

স্বপ্নের স্বরূপে ব্যাপ্ত আঁধারের বারিধি-হিল্লোল
রূপকথা ছেড়ে নারী উঠে আসে তীব্র হলাহলে
হৃদয়ে নেমেছে আজ নিরলস বিষাদবাদল
মরণ-পারাবারের ঢেউ ওঠে কূলে-উপকূলে।
বিশ্ব-প্রাণ জুড়ে সেই আর্তি শুনি, 'আলো, আরো আলো!'
স্বর্ণমৃগে এইবার নিরুপায় মোক্ষদা ঘুমালো।

তৃষাতুর

মৃত্যু-পাথার অদূরে ঝলকে ঝলকে
বিষ-অরণ্যে ভরে গেছে আজ দুই কূল
কাণ্ডারী হে, কোথায় ভিড়াবে তরণী?
ক্লান্ত আরোহী জল চায়-সে যে তৃষাতুর।

খেয়াঘাট খোঁজে ব্যাকুলিত যত যাত্রী
মানুষেরা তবু মানুষের মাঝে বিপরীত
আশ্রয় নেই— শুধুই বিপদসংকেতে
ভয়ার্ত নাও মহাপ্রলয়ের শোনে গীত।

তমসা প্রান্তে তবুও তোমার মন্ত্র
লিপিতে তোমার দেবীকণ্ঠের সুধা
নবজীবনের নবগীত দেবে ভরিয়ে
ভারতমাতার অমৃত-আধারে ধরা।

এ পরবাসে গড়ে নিতে হবে ঠাঁই তাই
কাণ্ডারী হে, তৃষাতুর আমি পথ চাই।

দিনযাপন

আমার কোনো স্বপ্ন নেই।
মনে করতে পারো এক প্রকাণ্ড মরুভূমি
যার কেন্দ্রবিন্দুতে টাঙানো আছে প্রকাণ্ড এক লাউডস্পীকার—
লাউডস্পীকারের একঘেয়ে নির্জলা সুরই আমার জীবন
তোমরা মনে করতে পারো।

এই যে আমি
আজ সারাটা দিন মন্দার গাছের ডাল থেকে
এঁটেল নালিতে জল পড়া দেখে দিন কাটালাম,
বসন্ত এলেও আমি ঠিক এই রকমই
ঘনশ্যামল বৃক্ষপত্রের মধ্যে লাল ফড়িঙের নাচ দেখে
আপন মনে হাসবো,
আমার এ হাসির কোনো অ্যানালিসিস নেই।
আমার স্মরণেই আসে না
রাংচিতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে কিশোরীর লুব্ধ চোখ
কখন আমাকে আড়ালে দেখে গেছে;
আমি আজ আপিস ভুলবো
কাল ভুলবো স্টেনোগ্রাফির ক্লাশ,
আমি আমার সব ভুলে যাওয়ার পৃথিবীতে
পুষ্পাচ্ছাদিত শিউলি গাছের মতো
আপন খুশিতে দুলবো,
আমার কোনো স্বপ্ন নেই,
আমি ওই ছোট্ট বুলবুলিটার মতো
আমার আমিকে নিয়ে নিজের জ্যোৎস্নায় বেশ ভালোই আছি;

মনোয়ার কাছে আমার একটা কড়ি পাওনা ছিল।

চেনা

যেতে যেতে পথে দেখা হ'ল তিনটি মানুষের সঙ্গে।
জিজ্ঞেস করলাম—
'মহাশয়দের নাম?'
একজন বললে, 'রাম',
একজন বললে, 'রহিম',
একজন বললে, 'রামু।'
জিজ্ঞেস করলাম—
'মহাশয়দের নিবাস?'
একজন বললে, 'রানাঘাট,'
একজন বললে, 'রংপুর,'
একজন বললে, 'রাজস্থান।'
জিজ্ঞেস করলাম—
'মহাশয়দের তবিয়ৎ?'
তিনজনে বললে—
'ভাল!' 'ভাল!' 'ভাল!'

রামের বুকে ছিল বিষণ্ণতার উদাস ধূমযোনি
আমি তার সেই বিষণ্ণতার কথা জিজ্ঞেস করিনি,
রহিমের চোখে ছিল দাবাগ্নির যুবতী শিখা
আমি তার সেই শিখাকে লক্ষ্য করিনি,
রামুর বুকে ছিল স্মৃতিমেদুর অক্ষয় প্রদীপ
আমি তার সেই প্রদীপের নিরুত্তাপ আগুনকে স্পর্শ করিনি।

চেনা শেষ করে আমি চলে গেছি
দক্ষিণ বরাবর নিজস্ব রাস্তায়।

কিন্তু যেতে পারি না

এক ছুটে চলে যেতে পারি কাছে তার, তার কাছে
কিন্তু যেতে পারি না।
জীবনের এই ধাঁধার উত্তর পেতে না পেতেই
দিন ফুরিয়ে গেল—
উত্তর পাওয়া গেল না।
শিউলি ফুলটা সন্ধ্যায় ফুটে
ভোর বেলায় ঝরে যাবে, যাবে ঝরে—
ভাবে না সে তবে আর কেন ফোটা।
কুকুরছানাটা দৌড়ে এসে
আমার পায়ের পাতায় লুটোয়, লুটিয়ে পড়ে
ভাবে না সে আমি স্নেহ দেব কি না।
অনাত্মীয় কোলের শিশুটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার বুকে, বুকে আমার
ভাবে না সে আমার কোলে কী তার অধিকার।
আমিও এক দৌড়ে চলে যেতে পারি এক দৌড়ে
কিন্তু যেতে পারি না
এক আলিঙ্গন দিয়ে বুকে টেনে নিতে পারি এক আলিঙ্গনে
কিন্তু পারি না,
এদিকে রাত নামলে কার আঁখি
নদীর ওপারের মতো ডাকে,'আয়!'
ভাঙনের শব্দ জাগে— আর ভয়ে আমি দৌড়োই
অন্ধকারে
অঘুমে
অনিশ্চয়তায়...

করণিক

এমনি ভাবে দিন যায় এমনি ভাবে দিন।
এমনি ভাবে বহতা
ক্ষীণ তটিনীর পারের পাথুরে রাস্তা ধরে
আমি সারাটা জীবন ধরে হাঁটি।
এমনি ভাবে নড়বড়ে কোমরটায় ভর করে
অশীতিতীর্ণ পথিকের মতো
রাক্ষুসে অন্ধকার ঠেলে
যেন বিপরীত স্রোতে উজান বাই।
এমনি ভাবে ঠোঁটের কোণে
কষ্টার্জিত হাসি টেনে
রক্তভুক কৃকলাশগুলোর সামনে
ঠক করে সেলাম ঠুকে মুখস্থ পাঠ বলি,
'ইয়েস স্যর!'
আর আড়ালে বলি, 'নচ্ছার!'
তারপর একদিন
দরজায় শমন জারি হলে
আমি নিঃশব্দে যাত্রা করি
আমার একমাত্র কাঙ্ক্ষিত পথে।
এমনি ভাবে দিন যায় এমনি ভাবে দিন...

দিন আসছে দলিতের

দিন আসছে, তৈরি থেকো।
আমাকে যারা দিবারাত্র পেরেক ঠুকে ঠুকে হত্যা করে
অথচ যীশুর মতো ক্ষমা করে যাওয়া ছাড়া
আমার আর উপায় থাকে না,
এবার তাদের মুখে মশাল ছোঁয়াব
স্বপ্ন-আঁটা সোফা থেকে তাদের সেবাদাসদের
টেনে এনে বলবো—
'জেনে রাখো—
পাথরেও প্রাণ জাগে
বৃক্ষও ভাষা হয়
ইতিহাস ঘুরে যায়!'
আমরা অবসন্ন কবিরা আর কবিতাকে কাঁদাবো না
আমরা আর নিজেদের মধ্যে মুকুর ছোঁয়ানো খেলা
খেলব না
সরু নদীর পাথুরে সীমানা ধরে রণপা ফেলতে ফেলতে
আমরা এগিয়ে যাব রামধনু দেশের দিকে।
আমরা আর যীশু হয়ে অপরাধীকে করুণা করব না,
দিন আসছে,
সহস্রাব্দর চশমাটা একটু একটু করে ভাঙতে থাকে।

একটু ভালোবাসা থাকলে

একটু ভালোবাসা থাকলে
আমাদের দুই প্রান্তরের মধ্যেকার
ভাঙা সেতু আবার জোড়া দেওয়া যেত,
একটু ভালবাসা থাকলে
আকাশের ক্লেদ মুছে দিয়ে
সেখানে অনেক স্বর্ণরেণু ছড়িয়ে দেওয়া যেত,
একটু ভালোবাসা থাকলে
ওই ক্ষুধার্তের মুখে
এক গ্রাস অন্ন তুলে দেওয়া যেত,
একটু ভালোবাসা থাকলে
এ পৃথিবীতে
অনেক অনেক কাজ করা যেত।

রবীন্দ্রনাথের গান

তোমার সঙ্গীতে জাগে জলের অন্তর্লীন প্রাণ,
নির্বেদ তমসা প্রান্তে জীবনের উত্তিতীর্ষু আশা
দুঃখের শিকড় নিয়ে আমি জেগে থাকি
অন্ধকারে তোমার সুরেতে যুগলবন্দী, জ্বেলে যাই
তোমার গানের দীপ চেতনার সকল কপোতকক্ষে,
চিরসখা হে, এ পরবাসে ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না!

স্বপ্নের অরুণাংশু ফোটে দুঃখের পারাবার প্রান্তে
হে কবি, এ কিশোরের জীবন বিষাদের দীর্ঘ
রেললাইন— তুমি তার উচ্ছ্বাসের অতন্দ্র সিগনাল,
এ মড়কের দেশের সুদূর দিগন্তে আজও
তোমার সঙ্গীতের ললিত ধ্বনি শোনা যায়,
ভালবাসার মুকুল ফোটে আমার ক্লান্ত চৈতন্যসত্তায়
নিয়ত তোমার সুরের অভ্যাসনে
চিরসখা হে, এ পরবাসে ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না!

ছবি-১

ধূ ধূ প্রান্তর।
জেগে ওঠে
পলাশ শিমূলের বন,
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে মোড়া
মেঠো পথ ধরে
গেয়ে গেয়ে
নেচে নেচে
চলে যায় মাতাল সাঁওতাল,
ভেসে ওঠে দুখিনি মায়ের মুখঃ
'খোকা এলি?'
গাড়ির ঝাঁকানির শব্দ
স্তিমিত হয়ে আসে...

ছবি- ২

শিশুটা কাঁদছে।
ব্যস্ততাতাড়িত ফুটপাতের
এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে
ছোট্ট পথশিশুটা কাঁদছে।
কেন ও কাঁদছে কেউ জানে না—
ও কি ক্ষুধার্ত ?
ও কি পরিত্যক্ত ?
ও কি পিতৃমাতৃস্নেহ বঞ্চিত ?
নাকি ও প্রহৃত ?
কেউ জানে না
বা জানার ইচ্ছাও রাখে না।

হাজার হাজার চকমকি গাড়ি
ওর পাশ দিয়ে চলে যায়
হাজার হাজার এস্ত অফিসযাত্রী
ওর পাশ দিয়ে চলে যায়,
অতিমানবিক স্থাপত্যকলারা
মরা মাছের মতো ওকে দেখতে থাকে,
কার্জন পার্কে বিদ্যাসাগর মশাই
যথারীতি বইটাকে উল্টো করে রেখে
নিশ্চল হয়ে ওকে দেখতে থাকেন।
কেউ ওকে জিজ্ঞেস করে না
'খুকি তুমি কাদছ কেন ?'
কেউ ওকে জিজ্ঞেস করে না
'খুকি তোমাকে কি কেউ মেরেছে?'
পথশিশুটা শুধু কেঁদেই যায়।

আর সেই কান্নার সাথে সাথে
তৈরি হয় আমার কলকাতার ইতিহাস।

কালের রাখাল

অকপটে নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে
ঠোক্কর খেয়েছি বার বার
যেন হৃদয়কে উন্মোচিত করা অপরাধ এক।
পণ্ডিতসভার তারা বলেছেন,
‘প্রতিক্রিয়াশীল, নয় পাঁঠা!’
হায় রে—
পাঁঠারও তো একটা হৃদয় থাকে।

আসলে পণ্ডিতসভার তারা জানেন না
একদিন মানুষের জন্যে
ট্যাঙ্কের সামনে আমিই দাঁড়াবো বুক পেতে।

ডাক

দূরে কোথাও আমি আমার সত্তাকে ফেলে এসেছি।
সারা দিনের যুদ্ধাভিযান সেরে আমি তার কথা ভাবি,
সে যেন সন্তানের মতো করুণ কণ্ঠে ডেকে ওঠে, 'বাবা!'

দিনের প্রহরা শেষ করে বাঁধের ওপারে সূর্য ডুবে যায়
চাঁদের টিকলি পড়ে সন্ধ্যা নেমে আসে ধানখেতে
গোধূলির লাবণ্য গায়ে নিয়ে
কেউ জানে না ওই আলপথ ধরে
বাউলের গানের মতো
কে আসে কোথা থেকে কে কোথায় যায়।

আমি দেখি দিগন্তের আয়নায় আমার সত্তার অভিমানী মুখ
দূরে কোথাও আমি সেই সত্তাকে ফেলে এসেছি,
সে যেন সন্তানের মতো করুণ কণ্ঠে ডেকে ওঠে, 'বাবা!'

সমুদ্রবন্দনা

গভীরতা, তুমি কতখানি নীল হতে পার জানি না, তবু
হৃদয় অনুভব করে আকর্ষণ এই গভীরতার অপর
প্রান্তের দিকে। রক্ত তুমি কতখানি জলাবৃত হও?
জানি না—তবু রক্ত অনুভব করে আকর্ষণ জলের
অলৌকিক স্পর্শে। এই যে লক্ষ লক্ষ বালককৃষ্ণের
দাপাদাপি, যেন আমার হৃৎপিণ্ডের হ্লাদিনী স্পন্দন,
যেন স্বপ্নোত্থিত নায়িকার মূর্ত আবির্ভাব—
উদ্ধতযৌবনা মায়াবিনী নীললোচনা, আমাকে নীল
স্বপ্ন দান করো, আমাকে লেহন করো তোমার কামাতুর
রসনা দিয়ে, আমার হাড়ের সুরঙ্গ দীর্ণ করো
গর্জনে তোমার।

এই নীল শূন্যতা আমি আপাদ মূল পর্যন্ত শোষণ
করে নেব; তারপর চলে যাব এই জীর্ণ পাংশু
পৃথিবীর দিকে শ্রেষ্ঠ হাসি হেসে—মৃত্যুর হাত ধরে
কোনো এক স্নেহশীলা জননীর কোলে আমার এ
আশ্চর্য সামুদ্রিক পীড়াকে বুকে নিয়ে তার কুণ্ঠাকুটিল
স্রোতের অন্তিম কৃষ্ণগহ্বরে।
সমুদ্র তুমি কি সুখী, না দুঃখী?

হে নতুন শতাব্দী

দুঃখের নদী কোথায় গিয়ে শেষ হয়— নতুন শতাব্দীও
আমাদের জানাবে না। আমরা আমাদের প্রকোষ্ঠায়িত
শীৎকার বিদীর্ণ আঁধারগহ্বর-অস্তিত্বলীন জগতে শুধু
সকল নিয়ে বসে থাকব পৃথিবীর শেষ খেয়ার প্রতীক্ষায়,
আমাকে আবৃত করো হে মৃত্যু।
দুহাত বাড়িয়ে গোটা পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছি
তার প্রেমমধ্যমার সুনিবিড় অন্বয়ে—ওরা ওদের নিজস্ব সত্যের
বাঘনখ দিয়ে সেই দুই হাত ক্ষতাক্ত করেছে। আমরা
ক্লান্ত, ধ্বস্ত, ভয়ত্রস্ত, জঠরাগ্নিদাবিত, কালরাত্রির বিষদন্তের
সামনে দাঁড়িয়ে বৃথাই কাঁদি; কাঁদি উন্মাদনে, ক্ষরণের
ব্যথায় আর মরীচিকা-বিরহে, আমাদের স্বর্ণমৃগ খোঁজা
বিবর্ণ সত্তা মেদুর স্বপ্ন আর দূষিত সহবাসের লক্ষণরেখায়
বিলোম নাভিশ্বাস নিয়ে জেগে থাকে এক অপরিবর্তনীয়
চরিত্রহীন কৃত্রিম ভোরের ভুবনায়িত অঙ্গনে—
আমাকে আবৃত করো হে মৃত্যু।
দহনের পর দহন এইভাবে চলে যাবে
জীবনের পর জীবন এইভাবে চলে যাবে
ভালোবাসার পর ভালোবাসা এইভাবে চলে যাবে
আমরা মানুষের পর মানুষ এইভাবে চলে যাব,
আমাকে আবৃত করো হে মৃত্যু
হে নতুন শতাব্দী।

অপাংক্তেয়

কবিতায় খাতা হাত থেকে পড়ে গেলে
সে বড় দুঃখ পায়,
যদিও সে একজন গেঁয়ো কবি।
জুয়ার আসরে সে কবিতার বই নিয়ে গেলে
কুৎসিত ভঙ্গীতে জুয়াড়িরা হাসে—
কেউ বইটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়,
বিশীর্ণ, বিবর্ণ, ম্লান সে
আবার ফিরে আসে কবিতার বইয়ের জগতে।
কিছুই তাকে আকর্ষণ করে না—
এক ভয়ানক রোগে সে আক্রান্ত,
রাজনীতির মঞ্চে যাদুওয়ালারা
যখন যাদু দেখায়—
কেউ লাল, কেউ সবুজ, কেউ বা গেরুয়া
আলখাল্লা পড়ে
সে চুপচাপ পিছনের সারিতে বসে ঘুমায়,
কখনও পার্কের বেঞ্চিতে বসে
কুখাদ্য খেতে খেতে
সুন্দরী কিশোরীটির দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে।
খবরের কাগজ সে কখনও পড়ে না—
সেখানে নাকি অদ্ভুত সব শব্দ সাজানো থাকে।
বোকা কোন বেড়ার হিসেবও বুঝতে চায় না,
ঢুকতে না পেলে
দণ্ডবৎ হয়ে থাকে শার্সির বাইরে,
সাজঘরের লোকেরা তাকে দেখে হাসে—
মড়া গাছে যখন ছত্রাক জমতে থাকে
সে নাকি দেখে রংবাহারি ফুলের স্বপ্ন ;
সে এক গেঁয়ো কবি—
কবিতাই তাকে শেষ করে দিয়েছে।

সুন্দর একটা কবিতার লাইন লেখার জন্যে

সুন্দর একটা কবিতার লাইন লেখার জন্যে
আমি অনেক কিছু করতে পারি।
রাতের পর রাত তেপান্তর তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে
চড়াই-উতরাই ভেঙে
হেঁটে যেতে পারি বহুদূর।

বহু বছর ধরে
সবুজ মাটির ওপর দাঁড়িয়ে
ওই হলুদ-রং বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি
তোমার হিমবন্ত মুখে
এক চাঁদফালি হাসি হাসব বলে;
আমি বিপ্লবের মধুবসন্ত হতে পারি
আবার মতলববাজ রাজনীতিকদের মুখে
থুথুও নিক্ষেপ করতে পারি,
জীবনের কঠিন কঠোর স্বেদ, ঘাম, রক্তের মন্থন থেকে
জেনে নিতে পারি সৃষ্টির রহস্য।
শুধু সুন্দর একটা কবিতার লাইন লেখার জন্যে
আমি শিশুর মধ্যে শিশু
ফুলের মধ্যে ফুল
কৃষকের চোখের অশ্রু
আবার ছায়ামাখা নদীর বুকে
ভাটিয়াল গান হতে পারি।

তারপর যখন
সে কবিতার লাইন লেখা হয়
আমি দেখি স্বর্গের প্রথম নদীর ওপর
নেমে এসেছে পূর্ণিমার চাঁদ—
আর সে আলোর বিচ্ছুরণে
বিভাসিত হয়ে উঠেছে সমস্ত পৃথিবী।

আগুন

দুঃখের ভিতর থেকে
জেগে ওঠে যে প্রদীপ
আমি সেই প্রদীপের আগুন,

অরণ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে
রাতের পাখিরা মেলেছে ডানা
আমি এবার সেই প্রদীপের
নিরুত্তাপ আগুন হব।

ফুটে ওঠা

প্রতিদিনের ব্যর্থতার মেঘ সরিয়ে
জেগে ওঠে আত্মা
হিমশৃঙ্গের মতো।
কাছে আসে সবাই—
থাকে না কেউ
তারা সবাই ব্যস্ত
সত্তার তেজারতি কারবার নিয়ে।
আমি দুর্মর কবি
জেনে গেছি
মরণের যন্ত্রণা ছাড়া
হৃদয়ের সৌন্দর্য ফোটে না।

বাঁশি

জীবনভর মানুষটা শুধু
তার বাঁশিটাকেই ভালোবেসে এলো।
বাঁশি তার ঘর কেড়ে নিল
তার বউ কেড়ে নিল
তার সর্বস্ব কেড়ে নিল
হাভাতে তবুও বাঁশিটাকে ছাড়লো না।

বাঁশি অরণ্যের পূর্বরাগ বোঝে
পুষ্পের কোমলতা বোঝে
নববধূর সোহাগ বোঝে;
বাঁশি যখন বাজে না
নৈঃশব্দ তখন গান গায় আর এক শূন্যেতর
হৃদয়ের নৈঃশব্দ মাঝে,
বাঁশি জানে একমাত্র এই মানুষটিই
এসবের অংশীদার—
শুধু তার আপন লোকগুলোই বোঝে না,
দুম দুম শব্দে তার জীবনের স্বাদ পেতে চায়।

মায়ের জন্মদিন

নেই কোনো মহার্ঘ খাবার
নেই কোনো আধুনিক উপচার
বিষণ্ণ এ ঘরে তবু আজ উৎসব।
একজন সকাল থেকে
রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছে,
আর একজন একরাশ কবিতা লিখে
জন্মদিনের উপহার দিয়েছে।
প্রোষিতভর্তৃকার চোখে জল—
‘ওগো তুমি একবার এসে
আমাকে ছুঁয়ে যাও!’
তিনি এলেন না আজও,
শুধু দয়িত সেজে মৃত্যু এসে
মাকে নিয়ে গেল সন্ধ্যাবেলা।

খারাপ-সুন্দর

সুন্দরভাবে যে বাঁচতে চায়
সুন্দরকে সে পায় না,
খারাপভাবে যে বাঁচতে চায়
খারাপকে সে পায়,
এর দ্বারা প্রমাণিত হল
সুন্দর কোনো চিরসত্য নয়।
কেননা সুন্দর ভাবে যে বাঁচতে চায়
সুন্দরকে সে পায় না,
খারাপভাবে যে বাঁচতে চায়
খারাপকে সে পায়।
বিশ্বায়নের বিশ্ব জুড়ে আজ
সেই খারাপ-সুন্দরেরই আরাধনা চলছে।

হঠাৎ দেখা

হঠাৎ কোনোদিন কীরকম যেন হয়ে যায়,
চেনা প্রতিবেশ হঠাৎ বিপরীত পৃথিবী হয়ে ওঠে।
সে মানুষটা ভিড় বাসে দেখলেই
নিজে দাঁড়িয়ে আমাকে বসতে দিত,
জানলা দিয়ে কোনদিন বাইরে তাকিয়ে থাকে
না দেখার ভান করে।
যে শঙ্খিনী রমণী আমাকে দেখলেই
দূর থেকে হাসি ছুঁড়ে দিত,
হঠাৎ কোনোদিন আমাকে দেখে
আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যায়।

হঠাৎ কোনোদিন দোকানদার আমাকে উইশ করে না
হঠাৎই কোনোদিন দমকা বাতাস আমার কাছে ছুটে আসে না
হঠাৎই কোনোদিন অয়স্কান্তবাবু ফিশ ফিশ করে
প্রতিবেশী সম্বন্ধে আর একটা চাঞ্চল্যকর খবর শোনায় না।

কখনও কখনও কোনোদিন কীরকম যেন হয়ে যায়,
সৌজন্য আর ভদ্রতার অভ্যাসে ক্লান্ত মানুষগুলো
কেমন যেন ভদ্রতার ভয়ে পালিয়ে যেতে চায়।

ছবি এলোমেলো

যদি গাছগুলোকে ভাবি শুকনো
গাছগুলো শুকনোই হয়।
এই বর্ষাধৌত নবপল্লবশোভিত বাহার—
কিন্তু আমার মনে হ'ল, 'কী ম্যাড়ম্যাড়ে!'
ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে রাঙা টুকটুকে বধূ—
তাকে দেখে হঠাৎ খুব রাগ হ'ল,
মনে হ'ল হতে পারে সে খুব সুন্দর,
কিন্তু পৃথিবীতে প্রেম নেই।
যদি ভাবি পৃথিবী জড়পিন্ডাধার
তাহ'লে পৃথিবী তাইই হয়,
যদি ভাবি পৃথিবী বরফ, তা'হলে পৃথিবী বরফই হয়।

হৃদয় এখন বিষাদ-কারখানার চিমনী,
সহজভাবে তাই কিছু গ্রহণ করতে পারি না—
মহৎকে মহৎ বলতে পারি না
আবার ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্রও বলতে পারি না।
জোরের সঙ্গে বলতে পারি না—
'আমি অমৃতের পুত্র,
অন্ধকার থেকে জাগতে চাই!'

কখনও দুম করে খোলা বাতাস এসে গেলে
অদৃশ্য এক তুলি
মগজের মধ্যে এলোমেলো সব ছবি এঁকে যায়;
আমি সে সব ছবির ভাষা, রং, মাত্রা
কিছুই বুঝতে পারি না,
তাই দুঃস্বপ্নের মধ্যে কখনও ঘোরের মধ্যে
বিড়বিড় করে জপি, 'ভিসুভিয়স জাগো!'

পরম আপন

কবিতার আলোকিত মন্দির নিয়ে
পথ হাঁটবে ভেবেছিল যে কিশোর
যৌবনে এসে দেখল সে
কবিতার রাস্তা চলে গেছে বেশ্যালয়ে,
'আমি বেশ্যালয়ে যাবো না—'
চিৎকার করে সে সবাইকে জানিয়ে দিল।

সবুজ ঘাসের মখমলের ওপর বয়ে যাওয়া
বসন্তবাতাস এসে ওদের বলে গেল—
'সে এসেছিল
সে এসেছিল,
এই ভোরে আবার সে একদিন ফিরে এসে
কবিতার গান শোনাবে।'
মানুষের ভিতর ভাসমান প্রজাপতি
ডানা মেলে তাকে বলবে
'আরো গাওঃ আরো...
কবিতার জানালা কখনও মেকি হবে না।'

কালসন্ধ্যা

একদিকে কবিতার পাণ্ডুলিপি
অন্য দিকে জীবনের শূন্যতাবোধ
কোনটা নদী, কোনটা সাগর কী জানি
আমি শুধু মোহনাকেই চিনি।

আশ্চর্য কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি ঘুমে
স্বপ্নের তুষার তার আলম্বিত
ভূমি হতে আকাশকে ছুঁয়ে,
প্রকৃতির মোনালিসা — যেন
তার নিজ হাতে গড়া,
নিদাঘের এ তমসুকে
রইবে সে চির-অধরা।

দুঃখ যদি দিয়ে থাকে কোনো আত্মপরিচয়
সে শুধু অসার শব্দপুঞ্জে হয় লীন
প্রাণ যদি দিয়ে থাকে কোনো আশ্চর্য আগুন
সে হয় ছিন্ন, অবলীন।
এ জীর্ণ শিকড়ে নারী
আরো জল ঢালো
কৃত্রিম ভোরের দেশে পণ্যের উৎসব শেষে
কালরাত্রি ঘনালো।

ফাঁকা

ঘরের ভিতর ঘরের ভিতর ঘরের ভিতর ঘর
শুধু শব্দ ঘর্ঘর
একার ভিতর একার ভিতর একার ভিতর আমি
নীরবে হাসেন অন্তর্যামী
স্রোতের মধ্যে স্রোতের মধ্যে স্রোতের মধ্যে স্রোত
ক্লান্ত কালের কপোত
মৃত্যুহিম মৃত্যুহিম মৃত্যুহিম জীবন
এই তন মন ধন
ভয়স্বপ্ন ভয়স্বপ্ন ওই রোদের ভিতর ছায়া
ঢাকা জীবনচাকা
আপন হতে বাহির   বাহির হতে আপন

সব ফাঁকা,

সব ফাঁকা।

ঝাড়গ্রাম

শঙ্খচিলের নির্জন বুক পেয়েছে মহুয়া ফুলের গন্ধ।
যাব না যাব না করেও মুঠি ভেঙে বেরিয়ে যাই
ওগো উতল হাওয়া—
ওগো দ্রিদিম শব্দ—
এই আনন্দ-আন্দোলিত প্রান্তরে
আমি কবিতার হাত ধরে
সূর্যাস্ত পর্যন্ত হেঁটে যাব,
ড্রাগনের নিঃশ্বাসের আড়ালে এসে
জেনে যাব—
আমারও হৃদয়ে গান আছে,
আছে অফুরন্ত জীবনের হাসি
ওই আদিবাসী
আর কুষ্ঠরোগীদেরও মুখে।

রুদ্রপ্রয়াগ

উচুঁ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে
নিশ্চিন্তে ঘাস খায় একটা হলুদ ঘোড়া।
সবুজ কার্পেটে ঢাকা পাহাড়
মাঝেমধ্যে রংবাহারি ফুলের গুচ্ছ।
পাহাড়ের অর্ধেকটায় ছায়া
অর্ধেকটায় আলো—
সে অর্ধাংশে বিচ্ছুরিত
সপ্তরং রামধনুর বর্ণালি,
পাহাড়কে ঘিরে রেখেছে
মন্থন-দড়ির মতো মন্দাকিনীর প্রমত্ত ধারা।
শহুরে লোকটার
আলোয় আলোকময় সে প্রকাশ দেখে
মুগ্ধবিহ্বল আঁখি,
অন্য দিকে নিঃস্পন্দিত অরণ্য
আর মৌন হিমবন্ত পর্বতমালা
মর্মরিত অরব শান্তিমন্ত্রে,
যাত্রীরা দলে দলে ছুটে চলেছে
পৃথিবীর সেই রূপালি শুদ্ধতার দিকে।
সেখানে কেউ আছে—
যদিও কেউ জানে না তিনি কে
যদিও কেউ জানে না কী তার আকার
যদিও কেউ জানে না সত্যিই তিনি ডেকেছেন কি না।

উঠোনে বৃষ্টির শব্দ

উঠোনে নেমেছে বৃষ্টি
সুখিয়া তোর হাঁড়িকড়াই ঘরে নে
বৃষ্টি বয়ে আনে বৃষ্টির ঘ্রাণ
সুখিয়া তোর হাঁড়িকড়াই ঘরে নে।

আমি এবার ঋষ্যশৃঙ্গ নয়ত কবিতার হৃদয় হব
ঝুলবারান্দায় তাস খেলে যুবক
লোক যায় ছাতা মাথায়— হাতে ব্যাগ
আজকে লগ্ন আছে মিশ্র অন্ন ভোজের
আমি শুধু অস্নাত অভুক
বৃষ্টির ঘ্রাণ নিয়ে কবিতার হৃদয় হব বলে।
এই ত সময়
মিশে যাওয়ার
নিরাভরণ জলপ্রপাতের সঙ্গে
বাহুপ্রসারিত হৃদয়ে
ফিরে যাও সুধীগণ
ঘরের ছেলে তুই ঘরের ছেলে হয়েই ফিরে যা,
সুখিয়া

উঠোনে বৃষ্টির শব্দ!
উঠোনে বৃষ্টির শব্দ!

অরণ্যমাতার কাছে

মুহূর্তের নবজন্ম তার হয়েছিল সে-সময়ে।
সে-সময়ে ঘুমে আর ওমে মিলে বিছিয়েছে
শূন্যেতর মৌনতা ত্রিবেণী পাহাড়ের গায়ে,
সার বেঁধে হরিণেরা নেমে গেছে। আদিবাসী
কুটিরের নিকোনো উঠোনে সাঁওতালি গান,
চা-এর সোঁদা গন্ধে এইমাত্র নেমে আসবে
সবুজ পাহাড় থেকে লাল টয় ট্রেন।

বুকের গভীরে তার
গভীর কপাট এঁটে সুগন্ধি তমালিকা,
হাওয়ায় বিচ্ছিন্ন স্মৃতি। শারীরিক সোপান
জুড়ে অলৌকিক পেথিডিন ছায়ার আশ্লেষে—
সে এসেছে কাল রাতের শেষতম ট্রেনে
সমস্ত পাপের ভ্রূণ ফেলে রেখে এসে
অহঙ্কারী স্থাপত্যের গায়। শুধু এই
মহাজাগতিক অরণ্যমাতার কাছে
কুলপথ বেছে নেবে বলে।

খড়ের নৌকা

নদীর বাঁকে অসীম রহস্য
আর আশ্চর্য গোধূলি,
ও বিলীয়মান খড়ের নৌকা—
তোমার ধর্মও নেই
যন্ত্রগণকও নেই
তোমার সহবাসে
ডুবে যাই ডুবে যাই
কবিতায় হৃদয়ে
ও বিলীয়মান খড়ের নৌকা—
তোমার বেদও নেই
সংশয়বাদও নেই
তোমার সহবাসে
ডুবে যাই ডুবে যাই
শঙ্খচিলের নির্জন বুক নিয়ে
তেপান্তর নগ্নতার সৌন্দর্যে
ও বিলীয়মান খড়ের নৌকা—
নদীর বাঁকে অসীম রহস্য
আর আশ্চর্য গোধূলি
তোমার সহবাসে
ডুবে যাই ডুবে যাই
মগ্নচৈতন্যের মায়াপালঙ্কে
ও বিলীয়মান খড়ের নৌকা—

গান্ধীঘাট

জল আর বৃক্ষের মাঝামাঝি
কবিতা দাঁড়িয়ে আছে
স্নেহময়ী জননীর মত;
তাই বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে
নদীকে সুন্দর মনে হয়,
নদীর বুক থেকে
বৃক্ষকে সুন্দর মনে হয়।
গতি আর স্থিতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে
কোন কোন দিন এইখানে আমরা
পারস্পরিক মুগ্ধতা অরণ্যে সঞ্চারিত করি।
ভালোবাসা-রেণু মোহানার দিকে
উড়িয়ে দিয়ে বলি,
'তরঙ্গ, আমাদের সুধা দাও
সুর দাও
কবিতার ওম্ দাও!'
বৃক্ষকে বলি—
'বৃক্ষ, তুমি আমাদের
আত্মার আলোকিত মন্দির দাও!'
মৃত্যুকে বলি—
'মৃত্যু, তুমি আমাদের মহাশূন্যের ধ্বনি
আর জীবনের আহ্লাদ দাও!'

কোন কোন দিন বসন্তবাতাসে সেই ধ্বনি : ওঁ শান্তি
কোন কোন দিন কুঞ্জচ্ছায়ায় সেই ধ্বনি : ওঁ শান্তি
কোন কোন দিন আমাদের নিবিড় ঐকতানে সেই ধ্বনি : ওঁ শান্তি
কোন কোন দিন বিরল মানুষী মায়ায় সেই ধ্বনি : ওঁ শান্তি

অরণ্যমর্মরের ঘেরাটোপের নীচে বসে থাকা মানুষগুলো—
কে যেন এসে বলে যায় কানে কানে ,
'বিশ্বায়ন মিথ্যুক! মিথ্যুক!'

চিঠি

শব্দে স্বপ্নে শোণিতে
নিরন্তর সেই শব্দের প্রতিধ্বনি :
তোমার ভালোবাসা।
ভ্রূপল্লবে লেগে আছে
ত্রিভুবন জোড়া এক আর্তি :
তোমার ভালোবাসা।

বিধুর আকাশ জুড়ে
বাজে স্মৃতির মন্দিরা।

সম্রাট জানেন না
আসলে আমারও একটা রাজ্যপাট আছে,
সেখানে শুধু দুটো শব্দ
আমাদের ভালোবাসা।

আর কিছু ভালোবাসা ভরা চিঠি।

না

দিগন্তের প্রান্তে একদিন
ওই হাত দুটো ধরে বলেছিলাম
'তোমায় ভালোবাসি!'
তুমি বলেছিলে, 'না।'

এখন এই উত্তর-পঞ্চাশেও
আমাকে দেখতে পেলে
দৌড়ে চলে আস—
ভুলে যাও পাশে দাঁড়ানো পতিদেবকে,
(সিনেমায় যেমন হয়)।

সেদিন বুঝিনি
তোমার ওই 'না' একদিন
সারা জীবনের সম্পদ হয়ে
বন্ধুর মতো আমাকে জড়িয়ে রাখবে।

আসলে নদী যখন ঘুমিয়ে থাকে
তখনই তো আমরা ভালোবাসাকে জানতে পারি।

মোহ

জীবনের ব্যবধান বাড়ে
সব ঢেউ তীর ছুঁয়ে চলে যায়
শুধু সীমার জন্য কিছু দুঃখ জমে থাকে।

তোমরা সবাই
বায়োস্কোপ দেখে ফেরার মতো
সুখের পায়ে হেঁটে যাও,
আমি আমার বিনম্র কণ্ঠস্বর
আর প্রত্যভিবাদনের আড়ালে
সর্পিনীর দংশন-ব্যথা চেপে রাখি।
অর্ফিয়ুস—
তোমার বীণার সুরে বুঝিয়ে দাও
সীমার জন্য আমি কত দুঃখ পেতে পারি,
অর্ফিয়ুস—
তোমার বীণার সুরে যে পাথর, যে গাছ
যে পাখিরা মুগ্ধ হয়েছিল
সীমার দংশনের ব্যথা তাদের বুঝিয়ে দাও।

জীবনে ব্যবধান বাড়ে
সব ঢেউ তীর ছুঁয়ে চলে যায়
তবু সীমার জন্য কিছু দুঃখ জমে থাকে।

বিচ্ছেদের পর

এই ঘর তাকে চাইছে।
দিগন্তে জুড়ে মায়াবী রাত নামলে
বুড়ী চাঁদ এসে বলে—
'সীমা কি আজ আসবে না?'
লকারে ঝোলানো চাবির গোছা,
দোমড়ানো বিছানা আর শূন্য চেয়ার প্রশ্ন করে,
'সীমা আজকাল আসে না কেন?'
আমার ছোট্ট ভুটিয়া কুকুরটা
জুল জুল চোখে আমার দিকে তাকায়, বলে—
'তুমি কি সীমার কথা ভাবছ?'

হঠাৎ মনে পড়ে—
সীমা তো চলে গেছে অনেক দূরে,
ঠিক তখনই
দেয়ালে দেয়াল মিশে একাকার
আমার বুক-জোড়া ঘরের শূন্যতা।

স্মরণ

হাওয়ায় ভাসে হৃদয়-শিমুল আমার
অঝোর রোদ— জলেতে আলপনা
রোদ বুঝি সেই জলকে ভালোবাসে
যেন এক মূর্ত সুরের মূর্ছনা।

জাহাজঘাটে জাহাজ-বাঁশি কাঁপে
সেই সুরেতে হঠাৎ পড়ল মনে
তোমার কথা, কোথায় কেমন আছ
বিরলে বসে আমায় কি আর ডাক?

আমার চোখে তোমার মুখের রেণু
আমার দিঘি তোমার গুল্মে ঢাকা
আমার মাথায় এক লক্ষ চড়ুই
তোমার কথার অবিশ্রান্ত ধারা।

পেয়েছিলাম তবু হয়নি পাওয়া
পাঁজরে তাই স্মৃতির ঘন্টা বাজে
নীল বনান্তে প্রথম প্রণয়-কথা
জড়ায় আমায় অতলস্পর্শী পাকে
পেয়েছিলাম তবু হয়নি পাওয়া
ব্যথার মেঘ আমার আকাশ ঢাকে।

বর্ষামঙ্গল

নীরবতা কম্পিত শব্দহীন রাত।
সারা দিনের মৃদু বৃষ্টিপাত—
এইমাত্র থেমে গেছে
তার উদারা—আলাপ।
দিগন্ত শুয়ে পড়েছে
উন্মুক্তবুক রমণীর মতো,
বৃষ্টির সুগন্ধে মাতোয়ারা
জিনিয়া ফুলের দল দুলছে,
নাচো হে চরাচর নাচো
কংক্রীট শহরে ঈশ্বরের বিরল করুণায়
বৃষ্টি এসেছে, জেগেছে
সুন্দরের ভিতর সুন্দর
প্রাণের ভিতর প্রাণ,

আমি আজ অনেক রাত পর্যন্ত দূরআলাপনে
অনের রাত পর্যন্ত...
বাল্যপ্রেমিকার সঙ্গে কথা বলবো।

তোমাকে

কেন বাৎসল্যে ফোটাও চৈতন্যে শুক্লা দ্বাদশী ?
ধরে রাখো করপুটে গভীর আশ্লেষে মৃত শস্যকণা
সব আলপথ যার ভরেছে প্লাবনে গূঢ় একাদশী
রক্তে মেখেছ সুধা, চন্দন সুরভি— ছিল যে তীব্র এষণা।

তুমি নারী গাঢ় লাল ঝিল্লিকার ডানার স্পন্দনে
ভরে রাখো আমার এ অলৌকিক সবুজ পর্ণরাজি
একদিন স্নেহস্পর্শে মুছে দেবে আমার এ পুরঞ্জনী-ব্যথা
আমার বেদনা বোঝে আছে কার দায় যদি তুমি দাও নীরবতা।

সমগ্র বিশ্ব খুঁজি সদৃশ উপমা চেয়ে তোমার অভাবে
কে জানে হেলেনের দেহশোভা এর চেয়ে ছিল কত বড় ?
আমার ক্লান্ত আঁখি অরণ্য-ছায়া চায় তোমার অধরে
তোমার রূপের মায়ায় মরুতে শ্রাবণ হয়ে আমাকে সিক্ততায় গড়ো।

অলৌকিক ঝর্ণা তুমি— নারীর ভিতর নারী
যাদুর চেরাগ জ্বেলে দিবানিশি বক্ষে বসে আছ।

আমার কবিতা

আমার কবিতা তীব্র
মদালসা ভর্তৃকার চুম্বনের মতো
আমার কবিতা সজীব জীবনের চেয়ে
আছড়ে পড়া দমকা হাওয়া
বাতাসে প্রকীর্ণ বীজ
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাওয়া
আসন্ন প্রজন্মের দিকে
আমার কবিতা সেই
নারীর প্রথম মাতৃত্ব-তিয়াষ
অথবা সপ্তাশ্ব-আরোহী সূর্য
কভু বা জলজ দস্যুর মতো আসে ধেয়ে।

আমার কবিতা স্নিগ্ধ
শিল্পের সঠিক সুষমা
যেন বতিচেল্লি চিত্রিত ভেনাসের মুখ
আমার কবিতা মুগ্ধ পুরুষের চোখে
স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদ
ভোরের কাকলি
স্বর্ণপুরীতে প্রভাত
সুন্দর সুন্দরতর সুখ।

আমার কবিতা জ্বালা
জরা ও ভয়স্বপ্ন
শিল্পীর শূন্যেতর ব্যথা
আমার কবিতা প্রেম-অনন্ত-
পয়োধি
নারীর গোপন দুঃখ
কৃষকের চোখে অশ্রু।
আমার কবিতা মধ্যাহ্নতা
জীবনের নিদাঘ-সত্য
কাসান্ড্রার অমোঘ নিয়তি
আমার কবিতা যুদ্ধ
হিংস্র বিজিগীষা
অ্যাকিলিসের ক্রোধ
পরাভব, আর্তনাদ ও মৃত্যু।

আমার কবিতা রূপ
স্থাপত্যের নিপুণ আধার
অনাবৃতার তনুজ সুষমা
আমার কবিতা প্রতীক
বসন্ত ও যৌবনের
হৃদয়ে প্রস্ফুটিত শৃঙ্গার
কিশোরীর নবাঙ্কুর বাসনা।

আমার কবিতা স্বপ্ন
অনন্ত ঢেউয়ের গান
দিগন্তের পুষ্পমেখলা
আমার কবিতা বিস্ময়
শিশুর দু-চোখ ভরা সাধ
প্রাণ ও ধমনী
সৃষ্টির আদিমতম মায়া।

আমার কবিতা শুধু মানুষ
মানুষের সৃষ্টি ও প্রয়াণ
মহাশূন্যে চিত্রিত ছায়া
আমার কবিতা মাটি
শুদ্ধ চৈতন্যের গান
বুদ্ধের পূর্ণতা
সভ্যতা, সৃষ্টি ও শান্তি।

ব্ল্যাক হোল

এতদিন যে জানালা দিয়ে
বাইরের পৃথিবীটাকে দেখেছিলাম,
যৌবনের সন্ধিক্ষণে এসে মনে হয়
আসলে সেই জানালাটাই ছিল মেকি।
সংশয় দানা বাঁধে
আর আতঙ্কের তীব্র সাপ
উঠে আসে জীবনের বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে।
মনে হয় এ পৃথিবীতে আমাকে বাঁচানোর জন্য
কেউ তার মানবতার হাত বাড়িয়ে দেবে না।
ভয়ে আমি ছুটি—
ছুটতে ছুটতে ছাড়িয়ে যাই
অন্ধকারে অসহায় যুবতীর আর্তনাদ
আর ঘাতকের রাস্তা
আমার স্থাপনা হয় কবিতার নান্দনিক রোদে

ধবল কিশোরী
তুমি আর ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে
আমাকে ডেকো না,
তুমি ত' জানো না—
তোমার ওই প্রসারিত বাহু একদিন
কামার্ত পুরুষের দংশনে রক্তাক্ত হবে,
তোমার ওই দূরগামী হাসিটুকু
শোষণের আতসী ফলন এসে
বাস্প করে নিয়ে যাবে

ধবল কিশোরী—
দোজখের জগত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য
তুমি আর ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে
            উজ্জ্বল বাগানের দিকে আমাকে ডেকো না।
আমার এ দেশে শৈশব নেই
আমার এ দেশে মাতৃত্ব-রূপকথা নেই
আমার এ দেশে মানবতা নেই
আমার এ দেশে শান্তি ওঁ শান্তি নেই।
এখানে হাজার অশ্বারোহীর মৃত্যু হল
এখানে হাজার রবীন্দ্রনাথ
পোড়া রুটি খেয়ে
কলের চাকায় কালঘাম ফেলতে ফেলতে
শিল্পের শহীদ হল।
এখানে প্রেমের বিলাসী খেলা, কিন্তু প্রেম নেই
এখানে মনুষ্যত্বের নিনাদী ঝংকার, কিন্তু মনুষ্যত্ব নেই
এখানে চৌরাস্তার গগন মুখরিত হয়
নিরন্তর 'এক পথঃ এক পথ' হ্রেষাধ্বনিতে,
কিন্তু কোনো পথ নেই।
আমার আশৈশব স্বপ্ন ভেঙে খান খান হ'ল
জন্মভূমি স্বদেশ আমার—
আমি কোন ভরসায় তোর স্নেহাবঘর্ষের দিকে
                        হাত বাড়াবো?
এখানে যে এখনও রুল ব্রিটানিয়া।

দীর্ঘ কবিতা

(জয় গোস্বামীর 'অঙ্গার দরোজা' পড়ে)

অনেক তো হ'ল লেখা দীর্ঘ কবিতা
এবং দুঃখনদীর ঢেউ গোনা,
জ্বলেছে কি ভালো
আমাদের ধূসর সত্তায়
এক প্রাণবিন্দু আলো?
এত শত অসংবেদ্য শব্দের অঙ্গরাগ
এত শত ঝংকার
এত বিলাপের বিনয়
এত ছন্দের অভিনয়
কি পেলো সময়—
কবিতার বাতাস
নাকি ঈশ্বরের আলো?

বরং ভালো—
লাগ লাগ যাদুর খেলা
সংস্কৃতির মঞ্চে
এক বাহাত্তুরে খেলা দেখায়
এক ষোড়শীর সঙ্গে
মঞ্চে যাদুওয়ালা বার করে
শত শত কবি
সংস্কৃতির মুখোশধারী প্রতিষ্ঠানসেবী।

হে স্বেচ্ছাত্মবিস্মৃত—
আগুন হও
কিন্তু উত্তাপ দিও না,
প্রজ্জ্বলিত হও

কিন্তু প্রতিস্পর্ধী হয়ো না,
মুখর হও
কিন্তু মুখ খুলো না,
কবি হও
কিন্তু অসির থেকে
মসীকে বড়ো ক'রো না।
বলো, 'ওঁ বিশ্বয়নায় নমো!'
বলো, 'ওঁ রতিক্রিয়ায়ই নমো!'
বলো, 'ওঁ ভোগবাণিজ্যায় নমো!'
বলো, 'ধর্ম মুনাফা, কর্ম মুনাফা, মূল্যবোধ মুনাফা!'

কে যেন চাঁদ খুলে এনে
চাকায় লাগিয়েছিল
দুটি ফিতেয় লজ্জা ঢাকে যে নারী
সব জ্যোৎস্না সেই তো নিয়ে নিল।

মেঘের কাছে হাত পাততে পারোনি
তাই কুয়াশায় ভাসিয়ে দিয়েছ
তোমার অপরাজিতা-বর্ণ ছাতা,
সে ছাতা কোথায় হবে স্থিত
কবি কি ভেবেছ কখনও— মিত বা অমিত?

এবার পরিক্রমা সারো
জলঙ্গী আর আমলাশোলের
এবার পরিক্রমা সারো
বিষাদ চরাচরের।

এবার পরিক্রমা সারো
চা-বাগান আর কৃষকের অশ্রুর

এবার পরিক্রমা সারো
বিলকিস আর কাজ-হারানো মজদুর।

এবার পরিক্রমা সারো
পথশিশু আর বস্তির
এবার পরিক্রমা সরো
বিচক্র আর ব্রহ্মশির।

এবার পরিক্রমা সারো
ম্যালেরিয়া আর ডেঙ্গুর
এবার পরিক্রমা সারো—
পথের ক্লান্তি আর কতদূর।

এই তো লিখেছ কবি—
'আমি তো কবিতা থেকে দূরে গিয়ে কাটাতেও পারি।'
স্বাগত কবির নূতন উদ্বোধন
এবার একবার দূরে চলো মন।

ভারসাম্যের খেলা শেষ
সৎ হতে আমায় অসতে নিয়ে যাও
ভারসাম্যের খেলা শেষ
সুর হতে আমায় বেসুরে নিয়ে যাও
ভারসাম্যের খেলা শেষ
আলো হতে আমায় অন্ধকারে নিয়ে যাও
ভারসাম্যের খেলা শেষ
ধর্ম হতে আমায় যাবতীয় বৈধর্মে নিয়ে যাও।

আমরা এবার এসে গেছি সায়াহ্নের ঘাটে
মা সরস্বতী বসে যেথায় লুকিয়ে একধারে
দিনশেষের শেষ খেয়া নিয়ে আসেন কবি
কালো জলে ভাসিয়ে নেবে শব্দজাহ্নবী।

জাগো ভারতমাতার অশ্রুতে লীন অগ্নিযোনি

নিষ্ঠুর নৈঃশব্দ মাঝে জাগে মৃত্যুর হিমচুম্বক
আর্ত আঁখিপটে লেখা বিপদের ভয়ালসংকেত
মানবতা চলে গেছে, জেগে আছে জিজীবিষা
জঘন-উত্তাপ নিয়ে আপন ঘৃণ্য বেড়াজালে,
জাগো কর্ণের অভিমান তোমার আজন্ম দহনে
জ্বালাও কুরুক্ষেত্র এই ঘোষণাবিহীন, হিমসিংহাসন
আর দাউ দাউ অগ্নিজটাজালে।

অথৈ গৌরব ছিল
পুষ্পিত উপত্যকা ছিল আর
মহীরুহ ছিল যত
অম্বরে শব্দজাহ্নবী
শতাব্দীর আদিবীজ
সঙ্গীতের স্বর্ণরশ্মিচ্ছটা
ইস্পাতের ঘোড়া ছিল
মহাতেজা দর্পিতা রমণী
বুকেতে ভারতবর্ষ ছিল
বসুধৈব কুটম্বকম
হৃদয়ে এষণা ছিল
ছন্দিত জনপদ ছিল আর।

এখন অনন্ত অন্ধকার সেই জনপদে
অন্ধকার আসে আর অন্ধকার যায়
কোন এক ভয়াবহ কান্নার দিকে—
'কাছে আসো, হাত ধরো সাথি!'

সাথি নেই— জমাট নৈঃশব্দ মাঝে
সে আর্তি বৃথাই ধ্বনিত হয়ে যায়।

ঐশি ছায়াপথ থেকে কৃষ্ণগহ্বরের দিকে
মায়ামুকুরের ভ্রমে ঝাঁপ দিলে হে ভারত
সেই ভ্রমে জাগ্রত ব্রহ্মাশির, সেই ভ্রমে
এ মহাজীবন অমৃতপথের যাত্রা ছেড়ে
ধ্রুবমধ্যমা হতে ধূমযোনির দিকে বয়ে যায়।

এ শহরের একদিন তৃতীয় নয়ন ছিল
আজ সে চক্ষুহীন হয়ে
'আলো দাওঃ আলো দাও' বলে
চৌরঙ্গীর মোড়ে চিৎকার করে,
পোড়ো বাড়ির ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে
রঞ্জনকে নয়— সে খোঁজে যক্ষপুরীর রাজাকে
কেননা রাজার অনেক বৈভব আছে
জাফরানি-রং শিশমহল আছে
রাজার প্রেম নেই, কিন্তু যৌনতা আছে
রাজার ছন্দ নেই, কিন্তু প্রতাপ আছে
রাজার পথ নেই, কিন্তু পথের শব্দ মায়া আছে।

স্বাধীনতা, বাছনি আমার—
আশৈশব ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে
যৌবনে এসে দেখি কামুক পিতার ঔরসে
বিকলাঙ্গ দেহ তোর হয়েছে প্রজনিত,
আমি তাই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে
ধ্বংসের নিনাদ খুঁজি।

জাগো ভারতের হৃদয়—
মৃত্তিকায় নিহিত অগ্নিযোনি জাগো
সবুজ মেঘমালায় নিহিত অগ্নিযোনি জাগো
নদীর কুটিল সলিলে সুপ্ত অগ্নিযোনি জাগো
ঘাতকের জ্বলন্ত আঁখিতে উৎকীর্ণ অগ্নিযোনি জাগো
স্থূলস্তনী মেঘগর্ভে সুপ্ত অগ্নিযোনি জাগো
অরণ্যের দামামা গর্জনে স্পন্দিত অগ্নিযোনি জাগো
দেহের ভিতরের আর বাইরের অগ্নিযোনি জাগো
বজ্রের ভুজঙ্গ প্রয়াতে জাগ্রত অগ্নিযোনি জাগো
অনন্ত কৃষ্ণগহ্বরের ঘোর অগ্নিযোনি জাগো
অপমানিতার উদ্ধত উরসিজের অগ্নিযোনি জাগো
সূর্যের ত্রিশূলে সমাকীর্ণ অগ্নিযোনি জাগো
ভারতমাতার অশ্রুতে লীন অগ্নিযোনি জাগো।

জাগো ভারতের হৃদয়—
আকাশ চিন্ময় হোক
বাতাস চিন্ময় হোক
ভূগর্ভ চিন্ময় হোক
বৃক্ষপত্র চিন্ময় হোক
ঘরের শূন্যতা চিন্ময় হোক
বৃহন্নলা জনপদ চিন্ময় হোক
নদীতরঙ্গ চিন্ময় হোক
ঝাউছায়া রমণীহৃদয় চিন্ময় হোক
স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ চিন্ময় হোক
জননী জন্মভূমি চিন্ময় হোক
কাল নিরবধি চিন্ময় হোক।

হয়তো কোনোদিন আমাদের জাগার আকাঙ্ক্ষা সোনালি রবিরেখার
কণা হয়ে ভোরের কূজনের দিকে ছুটে আসবে। হয়তো কোনোদিন
জীবনদেবতা এসে পাশে দাঁড়াবে। বলবে, 'ও এখনও ব্যথাঘুম
ঘুমোচ্ছে, এই ভোরের সকালে এইবার ওকে জাগিয়ে দাও—
শুকতারা ওকে হাতছানি দিচ্ছে।' হয়তো কোনোদিন
বুকের আকাশে মধ্যরাতের কোনো নতুন নক্ষত্র এসে বলবে,
'কাল ভোর হবে, মুক্তির ভোর, ঝলমলে ভোর। শুনতে পাচ্ছ
তার নিক্কণ?' হয়তো কোনোদিন এই কৃষ্ণগহ্বরের
অন্ধকার আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে নতুন সোনালি আলোয়
উদ্ভাসিত আমাদের স্বপ্নগর্ভসজ্জাত এই দেশ। হয়তো কোনোদিন
শেষ হবে এই আলোর মঞ্চে দাঁড়িয়ে অন্ধকারকে আবাহন
করার দুঃসময়।

হয়তো কোনদিন মেঘের বর্ণমালা দিয়ে আমরা
আকাশের পৃষ্ঠায় লিখব কবিতা:
ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি!'
লিখব, 'ভারত, ভারত, ভারত!'
হয়তো কোনোদিন ...

চিত্রবিচিত্র

(১)

অফুরান স্বপ্ন
আর অনিঃশেষ অশ্রু
এই ছিল তার জীবনের সম্বল,
অথচ দ্যাখো—
আজ তার মরদেহের পিছনে
জনতার বিরাট মিছিল।

(২)

অনন্ত জীবন থেকে
এক বিন্দু অমৃত
খসে পড়েছিল আমার সত্তায়,
আজ সেই সত্তাবৃক্ষে
কী সুন্দর শব্দের ফুল ফুটেছে দ্যাখো।

(৩)

সুনসান ফুটপাথে
বাচ্চা ছেলেটা
তার ভিখারি বাবার
গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে।
আর ভিখারি ভাবছে
এই মুহূর্তে তার চেয়ে সুখী
পৃথিবীতে কেউ নেই আর।

(৪)

'শালা নেশাটাকে একেবারে ছুটিয়ে দিল—'
'সুবর্ণরেখা' দেখে বেরোতে বেরোতে লোকটা বলল,
তারপর আবার ঢুকে গেল শুঁড়িখানায়।

(৫)

অমানুষদের মধ্যে
এসে পড়েছিল এক দেবদূত
অমানুষরা চিৎকার করে বলে উঠল,
'আমাদের মধ্যেখান থেকে
এই অমানুষটাকে বার করে দে।'

(৬)

আলো না অন্ধকার—
কবিতাকে কে বেশি প্রেরণা দেয়?
আসলে শরীর পাকিয়ে পাকিয়ে
যখন অন্ধকার উঠে আসে
তখনই তো মানুষ তাঁকে ডাকে।

(৭)

ভোরের শিশিরভেজা বাগানে
ইতস্তত উড়ছিল একটা প্রজাপতি
তাকে বললাম,
'আয় বুকে আয়!'
সে মুচকি হেসে উড়ে চলে গেল।

(৮)

এক অসূর্যম্পশ্যা নারী
এক শূন্যসত্তা পুরুষকে
অনেক চড়াই-উতরাই ভেঙে
হাত ধরে টেনে তুলেছিল
শৈলচূড়ার মন্দিরে,
পাহাড় থেকে নামার সময়
সেই শূন্যসত্তা পুরুষের হাতে ছিল
অন্য এক ছিনাল রমণীর হাত।

(৯)

দুঃখ নাকি মানুষকে পাথর করে দেয়,
পাথর হয়ে কি সে সমুদ্রকেও আটকাতে পারে?

(১০)

জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে
পড়ে গিয়েছি বার বার
এখন বুঝি দাঁড়ানোর থেকে
শুয়ে থাকাই ভালো
কেননা শুয়ে থাকলে উল্কাগুলো দেখা যায়।

(১১)

জীবনের আকার কিরকম —
জানতে পথে নেমেছিলেন কবি
দেখলেন জীবন ঈশ্বরও নয়
শয়তানও নয়,
জীবন এক সমুদ্রে ভাসমান মায়াসোপান।

(১২)

পবিত্র জল আমার করপুটে
পবিত্র অশ্রু আমার কনীনিকায়
পবিত্র ওঁ-কার ধ্বনি আমার মস্তিষ্কে,
তবু আমি শুয়ে আছি নর্দমায়।

(১৩)

আমি কুন্তী—
ধর্ষিতা তাই সর্বস্ব দেওয়ার পরেও
মহাপ্রস্থানের পথে আমার ঠাঁই হয়নি।

(১৪)

ভালোবাসা দিয়ে
ভালোবাসাকে গড়ে তুলতে হয়,
শেষ কথা এটাই।